বসন্তের প্রত্যাশা এবং টরন্টোতে ভাষা দিবস

শুজা রশীদ

ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হবার আগেই বসন্তের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে থাকলে আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। গত দুই শীত যেমন ম্যজ ম্যাজা গেলো তাতে ধরেই নিয়েছিলাম এবারও তেমন ভয়াবহ কিছু দেখবো না। বাস্তবে অবশ্য উল্টোটাই হল। ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে মাঠ ঘাট ভরিয়ে হৃদয় উজাড় করে তুষারের ঢল নেমেছিল। মন্দ লাগেনি। শীতের দেশে থেকে যদি তুষারের দর্শন না মেলে তাহলে তো ষোল আনাই মিছে।

যাইহোক, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রসংগ তুলেছি আবহাওয়া নিয়ে কাহিণী ফাঁদার জন্য নয়। বাংলাদেশীদের কাছে এই মাসটির কি গুরুত্ব সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না, ১৯৫২ র ২১ সে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের শহীদদেরর স্মরণ করবার যে প্রথা আমারা সযত্নে পালন করে চলেছি তা এখন আর দেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৯৯ সালে এই দিনটিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিলো জাতিসংঘ। জাগতিক অর্থে হয়তো এতে আমাদের দেশ এবং জনতার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি কিন্তু এটা আমাদের বাংলা ভাষাভাষিদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি অসম্ভব সম্মানজনক ব্যাপার।

টরন্টোতে প্রতি বছরই এই সময়টাতে নানান ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাঙ্গালী পাড়া বলে পরিচিত ড্যানফোর্থ এভেনিউতে শহীদ মিনার বানিয়ে সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ পর্যন্ত দেয়া হয়। প্রতিটি স্থানীয় খবরের কাগজেই সেসব খবর সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অস্বীকার করবো না GTA তে থাকলেও একটু দূরে থাকি ফলে মাঝরাতে সেখানে গিয়ে এই প্রথায় অংশগ্রহন করা কখনই হয় না। যারা নিকটে থাকেন বন্ধুদের সাথে তারা যান। সেখানে বাংলাদেশী দোকানে মুখরোচক খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকে। জমজমাট আড্ডা বসে। এই অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোক্তাদেরকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

আমার লেখার এই পর্যায়ে আমি আমার মেডিকেল সার্জেন্ট মামাতো ভাই কবীর এবং তার পরিবারকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে চাই। এর পেছনে একটি উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেটা খোলাসা করবো কিছু পরে। সারা বছর পড়ে থাকতে তারা ঠিক ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝখানে

টরন্টোতে এসে হাজির হল। উদ্দ্যেশ্য চমৎকার। ইমিগ্রেশন হয়ে গেছে। ল্যান্ডিং করলো। কাগজপত্র ঠিক করে আবার ফিরে যাবে আপাতত। সব গুছিয়ে টুছিয়ে পরবর্তিতে ফিরে আসার ইচ্ছা।

তাদের আবাস সৌদি আরবে। রিয়াদে। স্বামী – স্ত্রী দু'জনাই ডাক্তার। দু'টি সন্তান – ১২ আর ৪। যে কোন নতুন দেশান্তরী দেখলেই আমি বিশেষ রকম কৌতুহলী হয়ে পড়ি। কেন এই শীতের দেশে মরতে আসা? তাও আবার খোদ উত্তাপের রাজ্য থেকে। আমি নিজে এসেছি দক্ষিন থেকে (আমেরিকা)। উপায়ন্তর না দেখে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে টরন্টোর জীবনের প্রতি মায়া হয়ে গেছে। শীত হোক আর তুষার হোক দেশের বাইরে কোন মাটিকে যদি নিজের বলে জানি এই সেই মাটি। জানলাম সৌদি আরবে ডাক্তার বিধায় জীবন সব অর্থেই পরিপূর্ণ – আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক। ইনকাম ট্যাক্স নেই, অন্যান্য সুবিধার সাথে প্রতি বছর সরকারী খরচে স্বদেষ ভ্রমন করবার সুযোগ যোগ দিলে আর বাকী থাকে কি! কিন্তু সমস্যাও আছে। সেখানে চাকরী ক্ষনস্থায়ী। প্রতি বছর নবায়ন করা হয়। যে কোন মুহুর্তে বিদায় নিতে হতে পারে। সেই সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু অসম্ভব নয়। পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিও দেয়া হয় না। আরোও সমস্যা আছে। ছেলেমেয়েরা ১৮ বছর হলে তাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়। যৌবনে পদর্পনের জন্য মাসুল গুনতে হয়। ঠাট্টা করলাম। যে দেশের যে নিয়ম। প্রধানত এই কারণেই অনেকেই সেখান থেকে পৃথিবীর নানা দেশে চলে যায় বা যাবার ব্যাবস্থা করে থাকে।

সৌদি আরবের অনেক গল্প শুনলাম তাদের কাছে। নিজে কখনই যাইনি। যেমন কুনো ব্যাঙের মত টরন্টোর মাটি কামড়ে পড়ে আছি তাতে কখনো যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ। যাই হোক তার মুখে শোনা একটা ঘটনা বলছি। স্থানীয়দের মানষিকতার চমৎকার প্রতিফলন।

কবীর রাতে এমার্জেন্সীতে ডিউটি করছে। সবাই এসে আগে স্লিপ নেয়। একে একে রোগীদেরকে ডাকা হয়। এক সৌদি তার সমগ্র পরিবার নিয়ে এসে হাজির। সবার জন্য একটা করে স্লিপ নিয়েছে সে। তাদের যখন ডাক পড়লো সে সবাইকে নিয়ে তার কাছে এলো।

– রোগী কে?

"আমরা সবাই।" [কুল্লু আহাদ মান্না]

"সত্যি?

"হ্যাঁ।"

কবীর সবার উপর একবার চোখ বুলিয়েই বুঝলো এখানে রোগী একটি দশ বছরের ছেলে। কিন্তু এদের স্বভাবই হচ্ছে দল বল নিয়ে হাজির হওয়া। অযথা চাপ বাড়ে কিন্তু ওদেরকে কে বোঝাবে। আসবার অধিকার আছে, এসে হাজির হয়। সে একে একে সবাইকে দেখলো। সবার জন্যই এটা সেটা অষুধ প্রেসক্রিপশন লিখতে হল। সব গুলো পরিবার প্রধানের হাতে ধরিয়ে দিলো সে শুধু বাচ্চা ছেলেরটা সরিয়ে রাখলো। দলবল নিয়ে ভদ্রলোক গেলো ফার্মেসীতে। কয়েক মিনিট পরেই সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। “ডাক্তার আমার আসল রোগীর প্রেসক্রিপশনটাইতো নেই এখানে।“

তাকে বেশ একটা ছবক দিয়ে প্রেসক্রিপশনটা হাতে ধরিয়ে দেয়া হল। কিন্তু সন্দেহ নেই সে আবারও একই কাজই করবে।

আরেকটি ঘটনা বলি। প্রচন্ড জোরে গাড়ী চালায় স্থানীয় সৌদি যুবকেরা। যুবতীদের ড্রাইভ করবার অনুমতি নেই। সেই ব্যাপারে আমার ব্যক্তগত কিছু ঋনাত্বক অভিমত আছে কিন্তু সেসব আর এই লেখায় টেনে আনতে চাই না। এই আধুনিক যুগে নারীকে এমন সুরক্ষিত, সীমিত করে রাখাটা কতখানি প্রযোজ্য এমনকি ধ্বরমীয় দৃষ্টীকোন থেকে তাতে মনে সন্দেহ জাগে। অনেকের সাথেই আলাপ করেছি, জ্ঞানী গুনি অজ্ঞ বিজ্ঞ, একটি ব্যাপার খোলাসা হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই দোদুল্যমনতায় ভোগে। যাক সেসব। ঘটনাটা বলি।

নতুন গাড়ী কিনে রাস্তায় নেমেছে কবীর। বোধহয় দ্বিতীয় দিন। প্রশস্ত রাস্তা, সৌদি তরুনদের ভয়াবহ বেগে গাড়ি চালানোর অভ্যাসে ভয় তারই বেশী। কখন কি হয়ে যায়। প্রায়ই ভয়াবহ সব এক্সিডেন্ট হয়। এক দিন আগেই তার স্ত্রী তার জন্য একটি গিফট কিনেছে। সেদিন রাতে তাকে উফার দিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে। কপাল খারাপ। হাইওয়েতে এক উড়নচন্ডী স্থানীয় ছেলে ঠিকই ধাম করে গাড়ীতে এসে লাগিয়ে দিল। কপাল ভালো গাড়ির অবস্থা টাইট হলেও কারো কোণ শারীরিক ক্ষতি হয় নি। কবীর তার গাড়ীর শোকে এতই মুষড়ে পড়লো যে সে একটু পর পরই বিড়বিড়ি করে বলেতে লাগলো,”আমার নতুন গাড়িতে মেরে দিলে? এটা কি করে হল?”

যুবককে দেখে খুব একটা উদবিগ্ন মনে হল না। পুলিশ চলে এলো। তার করুণ অবস্থা দেখে সে চিন্তিত কন্ঠে বলল, “ডাক্তার, তুমি ঠিক আছো তো?”

বেচারীর অবস্থা দেখে তার স্ত্রীর কি মনে হল, সে গিফটটা বের করে পুলিশের সামনেই তার হাতে ধরিয়ে দিল। “তোমার জন্য কিনেছিলাম।“

যেদিন ওরা টরন্টোতে এলো তার ক'দিন আগেই বিশাল তুষার ঝড় হয়ে গেছে। চারদিকে ধবধবে সাদা হয়ে আছে, রাস্তার দুপাশে টিলা সমান তুষারের স্তুপ। ভেবেছিলাম গরমের দেশ থেকে এসে বেচারীরা এই সব দেখে মুষড়ে পড়বে। উলটো হল। তার ছেলেমেয়েরা তুষারের মধ্যে লুটোপুটি খেতে যা বাকী রাখলো। ওদের আনান্দ দেখে মনে পড়লো আরেক কবীর ভাইয়ের দুই ছেলের কথা। তারা বলতো যদি তুষারটাকে সাথে নিয়ে যাওয়া যেত তাহলে তারা বাংলাদেশে ফিরে যেতে খুব একটা কষ্ট পেত না। যারা এই বস্তু দেখেনি, স্পর্শ করেনি তারা এই অনুভুতি বুঝতে পারবেন না। কবীর ভাই দেশেই ফিরে গেছেন। সুবিধাজনক কাজ জোগাড় করতে পারেননি এই দুর্বল চাকরীর বাজারে।

আমার মামাতো ভাই কবীরকে স্কারবরোতে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নীচ তলায় থাকার ব্যবস্থা করলাম। এটা সেটা নিয়ে কিছু সুবিধা অসুবিধা হলেও সার্জেন্ট সাহেব এবং তার ডাক্তারনী স্ত্রী মানিয়ে নিলো। ক'দিনেই তারা টরন্টোতে ঘুরতে ফিরতে লেগে গেলো। বাস-ট্রেন সব নখদর্পনে।

একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে রোববার বিকালে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো BCCS (Bangladesh Cultural and Community Services) ড্যানফোর্থের একটি সভাকক্ষে । বাচ্চাদের ছবি আঁকার প্রতিযোগীতা সহ নানান বিষয়ে আলাপ আলোচনা হবে। কবীর ডাক্তার হলেও রাজনীতিতে মনযোগ আছে। দেশপ্রেম ভয়াবহ। উচ্চশিক্ষা, চাকরী, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত - নানান কারণে দেশের বাইরে পা রাখলেও তার কথা শুনে মনে হয় সম্ভব হলে সে তখুনিই দেশে ফিরে গিয়ে মানুষের সেবা করতে লেগে যায়। এই অভাগার কাছে সেসব হাস্যকর মাত্র। মানব সেবা? আমার সেবা কে করে?

সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে সময় মত হাজিরা দিলো তারা। চিত্র অঙ্কন পর্ব শেষ হতে বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। এই পর্যায়ে সংক্ষেপে বলে রাখি আমি ব্যক্তিগতভাবে তথ্যভিত্তিক রাজণীতিতে বিশ্বাসী। (আমার অভিমত হচ্ছে রাজণীতি শব্দটাই ভুল। রাজা ফাজা বহু আগেই গত হয়েছে, তাদের আবার নীতি কি? জননীতি অনেক যথপযুক্ত শব্দ)। যার অর্থ আমি না ঘরকা না পরকা, যা ভালো তা ভালো , যা খারাপ তা খারাপ। যাই হোক, এই বিশেষ বক্তা বোধহয় আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে থাকবেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য তারাই সোচ্চার ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের কথা উঠে আসবে তাতে সন্দেহের কিছু নেই। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছিলেন বক্তা। জিয়াউর রহমানের ভুমিকা নিয়ে আজ বোধহয় আর কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ হয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়েছিলেন রেডিওতে। কবীর

বি।এন।পি ঘেষা হবার কারণে ছেলেও হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। সে হঠাত এক পর্যায়ে উঠে দাড়িয়ে গেলো। সৌদিতে ইংলিশ স্কুলে প্রড়াশুনা করবার কারণে তার ইংরেজী চমৎকার। “আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?” সে জানতে চায়।

বক্তা বোধহয় তার আগ্রহ এবং উদ্দীপ্নায় আনন্দিতই হয়ে থাকবেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করবার জন্য উৎসাহিত করলেন।

“বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং স্বাধীনতায় জিয়াউর রহমানের কি ভুমিকা ছিল? আপনি তো তার কথা কিছুই বললেন না।“ ছেলেটির সোজা সাপ্টা প্রশ্ন।

বক্তা ভড়কে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি চমৎকার ভাবে পরিস্থিতি সামলে দিয়ে জিয়াউর রহমানের ভুমিকা নিয়ে কিছু কথা বললেন।

সেই একই অনুষ্ঠানে আরটি বাচ্চা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলো। “নিয়াজী কেন অরোরার কাছে আত্মসমর্পন করলো?”

পাঠক্কুল, আমার উদ্দেশ্য এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে বিশাল আলাপ জুড়ে দেয়া নয়। কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম যে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী হবে সেটা জানা কথা। কিন্তু আমাদের একটি বড় দায়িত্ব হবে তাদেরকে যথাযথ এবং নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান করা, ঐতিহাসিকদের দৃষ্টীকোণ থেকে। আমাদের সমর্থনকে যেন আমাদের সন্তানেরা অন্ধের মত অনুসরণ না করে। তারা যে প্রশ্ন করছে এটা একটা অসম্ভব ভালো ব্যাপার। কিন্তু তাদের প্রশ্ন যেন হয় কৌতুহল ভিত্তিক এবং উত্তরও যেন হয় তথ্যভিত্তিক। যে বিষবাষ্প আমাদের জননীতিকে কালসাপের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পরবর্তি প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব, তা আমারা যে দেশে যে সমাজেই বসবাস করি না কেন।